রামজন্মভূমি দর্শন

শঙ্কু মহারাজ

একটু বাদে অর্ধেন্দু জিজ্ঞেস করে - এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?
রামজন্মভূমিতে। আমাদের মুসলসান অটোওয়ালা রিয়াধ উত্তর দেয়।
উত্তরটা কানে আসতে আমার সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে যায়। এখন আমরা চলেছি বর্তমান ভারতের সবচেয়ে Sensitive বা মর্মান্তিকভাবে অনুভবশীল স্থানে। সাঁইত্রিশ বছর আগে একবার এসেছিলাম। তখন কেমন দেখেছি, আজ কেমন দেখব?
জানি না। কেবল জানি এই সাঁইত্রিশ বছর বয়সে সরযু দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে একদল রাম কে হিন্দু বা নিয়েছেন, আরেকদল রামমন্দির নির্মাণকার্যকে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী বলে প্রচার করেছেন এবংছলে বলে ও কৌশলে আদালতের আদেশকে ক্রমেই পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ তাদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। রামভক্তির নামে ধর্মান্ধত ার জোয়ার সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে আর ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোসধারীরা সেই সহজ সরল নিরস্ত্র মানুষগুলির ওপরে গুলি চালিয়েছে। অসহায় মানুষগুলি নিজেরা মারা গিয়ে প্রমাণ করেছেন, রাম এখনো ভারতীয় জনমানসে বেঁচে আছেন।
তারপর সেই মসজিদ, যেটি আমি সাঁইত্রিশ বছর আগে রামজন্মভূমি বলে জেনে গিয়েছি এবং তারও অনেক আগের থেকে যেখানে আজান দেওয়া এবং নমাজ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই সৌধটিকে অকারণে গুঁড়িয়ে দিয়ে রামভক্তির পর াকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাধিয়ে দেওয়া হল দাঙ্গা। কিছু নিরপরাধী হিন্দু-মুসলমান অকারণে নিহত হলেন। আর আমি অযোধ্যায় এসে এখন কোনো মন্দির কিম্বা মসজিদ দর্শন করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি একটি ভগ্নস্তূপ দেখতে। রাজনীতির কি বিচিত্র বিধান!
প্রকান্ড একটা গাছের ছায়ায় একফালি মাঠে রিয়াধ অটো থামালো। মাঠের উল্টোদিকের পথের সমান্তরালে সুউচ্চ প্র াচীর। গাছের ছায়ায় আরও কয়েকখানি অটোরিক্সা এবং খানদুয়েক গাড়িও রয়েছে। আর রয়েছে কিছু দোকান, পুরি-হালুয়া, কচুরি, জিলেপি, চা ও শীতল পানীয় এবং আখের রসের দোকান। কয়েকজন চুড়ি, মেয়েদের সাজার উপকরণ ও বাচচাদের খেলনা নিয়ে বসেছে। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে স্বচ্ছ প্লাস্টিক প্যাকেটে নকুলদানা ও তালমিছরি ভরে নিয়ে প্রসাদ বলে বিক্রি করছে। অর্থাৎ এই মাঠটিকে মেলা-কাম কারপার্ক বলা যেতে পারে।
গাড়ি থেকে নেমে রিয়াধ একজন নকুলদানা বিক্রেতাকে কাছে ডাকে। তারপরে অর্ধেন্দুকে বলে- দাদা, এই হচ্ছে জন্মভূমিতে পুজো দেবার প্রসাদ। দুজনে এর চারটি প্যাকেট নিয়ে যান, পুজোর পরে দুটি ফেরৎ পাবেন।
- কত করে? অর্ধেন্দু জিজ্ঞাসা করে।
- পাঁচ টাকা।
- এই কটি নকুলদানার দাম পাঁচ টাকা!
- আজ্ঞে সরকারী ছাপ মারিয়ে আনতে হয়। সে প্যাকেটের ওপরে একটি গোল ছাপ দেখায়। তারপরে আবার বলে- এজন্য তাদের দু-টাকা করে দিতে হয়। একটা টাকা না পেলে আমরা কি খাবো।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয় রিয়াধ। জন্মভূমির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অন্য কোনো মিষ্টি বা ফল নিয়ে যেতেদেওয়া হয় না সেখানে। নিরপত্তার নামে নিয়ম করা হয়েছে এমনি স্বচ্ছ প্লাস্টিকে সরকারী ছাপমারা প্যাকেট কেবলনিয়ে যাওয়া যাবে। অতএব প্যাকেট প্রতি দু-টাকা দক্ষিণার ব্যবস্থা। ব্যাপারটা তো ছেলে-খেলা নয়, রামজন্মভূমির নিরাপত্তা।

আর কোনো কথা না বলে অর্ধেন্দু বিশটি টাকা দিয়ে চারটি প্যাকেট নেয়, দুটি আমাকে দিয়ে দুটি নিজের কাছে রাখে। রিয়াধ রাস্তার ওপারে উঁচু দেওয়ালটা দেখিয়ে বলে- এটাকে বাঁদিকে রেখে সামনে এগিয়ে যান। ঐ যেখানে দেওয়াল শেষ হয়ে গেছে, সেখানে লোহার ফেন্সিং পাবেন। সেই ফেন্সিংকে বাঁদিকে রেখে পথ চলতে থাকবেন। গেটের সামনে পৌঁছে যাবেন। সেখানে পুলিশ আছেন, তাঁরাই দর্শনের নিয়ম বলে দেবেন। দর্শন শেষে ঐ উল্টোদিকের পথ ধরে ফেন্সিং ও দেয়ালকে বাঁদিকে রেখে ফিরে আসবেন এখানে।

- তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে ?

- না, দাদা। একে তো গাড়ি ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না, তার ওপরে আপনার ক্যামেরাটাও রেখে যেতে হবে আমার কাছে। ওঁরা ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে ভেতরে যেতে দেবেন না।

অর্ধেন্দুর ক্যামেরাটি বেশ দামী। রিয়াধের সঙ্গে পথ চলছি কেবল কয়েক ঘন্টা, ওর বাড়ি - ঘর কিছুই আমরা জানি না, তবু অর্ধেন্দু কোনোরকম দ্বিধা না করে ক্যামেরাটি তার হাতে দিয়ে দেয়। সেটি গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে রিয়াধ বলে - আর দেরি করবেন না দাদা, এবারেএগিয়ে যান।

সেই মেলা- কাম-কারপার্ক থেকে নেমে আসি রাস্তায়, রিয়াধ যেমনটি বলে দিয়েছে, তেমনি এগিয়ে চলি। এখন বুঝতে পারছি, সে না বলে দিলেও চলতে পারতাম। কারণ সামনে আরও অনেকে চলেছে - বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, আর শিশুদের সারি। সর্বস্তরের মানুষের শোভাযাত্রা - দরিদ্র ও নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শহুরে মানুষ। রয়েছে জিন্স-পরা যুবক-যুবতী, গেয়াধারী সন্ন্যাসী, টিকিধারী কিম্বা তিলক কাটা ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব। গ্রীষ্মের প্রচন্ডদাবানলকে উপেক্ষা করে সবাই একসারিতে রামজন্মভূমি দর্শন করতে চলেছেন।

কিন্তু কেন? কৌতুহল কিম্বা ভক্তি? ধর্মান্ধতা কিম্বা মানবতা? বোধকরি শেষেরটাই সত্য। রামচন্দ্রের মানবতাই রামভক্তির উৎস। শ্রীরামচন্দ্র আজও মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে স্বীকৃত। তাই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এঁরা ছুটে এসেছেন এখানে। আমরাও তাঁদের সামিল হয়েছি।

ইটের উঁচু দেওয়ালটা শেষ হয়ে যায়। বাঁদিকে বাঁক নিই। এবারে উঁচু লোহার ফেন্সিং। এখন আমরা বিতর্কিত স্থানের অনেকটাই দেখতে পাচ্ছি গরাদের ফাঁক দিয়ে। অনেকখানি জমি, কিন্তু ফাঁকা মাঠ নয়, একটা সুবিশাল লোহার খাঁচা। সত্যি অবাক কান্ড! এতো পাইপ, শিক, জাল দিয়ে জায়গাটিকে এভাবে ঘিরে রেখেছে কেন? - জনৈক মধ্যবয়সী ভক্ত উত্তর দেন- করসেবকদের ভিড় ঠেকাতে।

কিন্তু ভিড় ঠেকিয়ে কি লাভ হয়েছে? মসজিদ ভেঙেছে, মন্দির তৈরী হয়নি, মসজিদ ও মন্দির দুই-ই এখন ভগ্নস্তূপ। অথচ মথুরায় কৃষ্ণজন্মভূমি সেবাট্রাস্টের পদ্ধতি অনুসরণ করলে এই লোহার খাঁচা তৈরীর কোনো প্রয়োজন পড়ত না। একই দেওয়ালের একদিকে মসজিদ, অন্যদিকে মন্দির। শুধু কৃষ্ণমন্দির নয়, সেইসঙ্গে ভাগবত ভবন, গ্রন্থাগার, রঙ্গমঞ্চ, আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় ও সংস্কৃত বিদ্যালয় ইত্যাদি। একই মাটিতে কৃষ্ণ ও আল্লার আরাধনা চলেছে। হিন্দু ও মুসলমান শান্তিতে সহাবস্থান করছেন।

অযোধ্যায়ও তাই হতে পারত, যদি ব্যাপারটার মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ না ঘটত এবং পন্ডিত মদনমোহন মালব্যর মতো কোনো শিক্ষানুরাগী কর্মযোগী ও দেশভক্ত এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতেন। আমার বিশ্বাস, সদিচ্ছার সহায়তায় আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার এখনও শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব এবং এখানে এসে স্থানীয় মানুষদের কথাবার্তা শুনে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।

ভাবনা থেমে যায়। সেই লোহার পাশে পাশে পথ চলে রামজন্মভূমিতে প্রবেশ করবার পুলিশী তোরণের সামনে পৌঁছে গিয়েছি। অযোধ্যার পুলিশের পারদর্শিতার প্রমাণ আমরা গতকাল পেয়েছি। যাঁরা দেড় ঘন্টার চেষ্টায় দেড় কিলোমিটার দূরে বেতার-সংযোগ স্থাপন করতে পারেন না, তাঁরাই এখানে রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার সভাসদ হয়ে বসেছেন। আমিও কবির মতো ভেবে পাচ্ছি না -

'মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি আছে হেন যমের মুরতি।'...
লোহার তার ও গ্রিল দিয়ে তৈরী গেট। বড়, মাঝারি ও ছোট বন্দুক হাতে বহু পুলিশ, সামনে পেছনে ডাইনে ও বাঁয়ে। জনৈক হাবিলদার আমাদের এক লাইনে দাঁড়িয়ে যাবার আদেশ দিলেন। আমরা সে আদেশ পালন করি।
লাইন ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছে, আমিও একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি। একসময় আমার পালা আসে। জনৈক পুলিশ জিজ্ঞেস করেন - আপকি পাস ক্যামেরা হ্যাঁয়?
- নহী। মাথা নেড়ে বলি।
- কোই দূরবীন?
আমরা মাথা নাড়ি।
আবার প্রশ্ন - কেয়া হ্যাঁয়?
-কুছ নেহী।
-তব ই কেয়া হ্যাঁয়? তিনি আমার পকেট থেকে নোটবই ও ডটপেনটি বের করে নেন।
আমি চুপ করে থাকি। তিনি নোটবুকটা খুলে দেখে আমাকে ফেরৎ দেন। কিন্তু ডটপেনটি দেখিয়ে বলেন- ইয়ে সাথমে নহী যায়েগী।
ভাবি বলি - মহাশয়, এ বস্তুটি রিমোট কন্ট্রোল নহে, নিতান্তই সাধারণ লেখনী।
কিন্তু হলে কি হবে? অযোধ্যার পুলিশ বোধকরি ধর্মকথায় কান দেন না।
কলম হস্তগত করে তিনি আমারপ্যান্টের পকেটে হাত দেন । মাল ও নস্যির কৌটো বের করেন। মালখানি ফেরৎ দিয়ে নস্যির কৌটোটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন - ইয়ে কেয়া হ্যাঁয়?
কৌটা খুলে নস্যি ও আমার নাক দেখিয়ে বস্তুটিকে বোঝাবার চেষ্টা করি।
বৃথা বাক্য ব্যয়। তিনি কৌটোটি রেখে দিয়ে বলেন - ইয়ে ভি সাথমে নেহী যায়গী।
অগত্যা নস্যির মায়া পরিত্যাগ করে এগিয়ে চলি। বর্তমান সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী এখানেও ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক সিকিউরিটি কন্ট্রোল গেট বসানো হয়েছে। তারই ভেতর দিয়ে গিয়ে যাত্রীদের জন্মভূমি দর্শনের লাইন লাগাতে হবে।
পেশমেকার বসাবার পরে গত দশ বছর ধরে আমাকে এ ধরনের গেট পার হতে হয়নি। কারণ এই প্রবল চৌম্বকশক্তিস ম্পন্ন দরজার মধ্য দিয়ে যাওয়া পেশমেকারের পক্ষে নিরাপদ নয়।
বিমানবন্দর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত যেখানেই গিয়েছি, আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতেই ছাড় পেয়ে গেছি। আমার গায়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে আমাকে পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে যেতে দিয়েছেন।
তাই পকেট থেকে আমেরিকার ইন্টারমেডিকস্ কম্পানির Cardiac Pacemaker Identification
কার্ডখানি পুলিশ অফিসারের হাতে দিই।
তিনি কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেন - ইয়ে কেয়া হ্যাঁয়?
আমি তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করি। তিনি শেষ করতে দেন না, বলে ওঠেন - বাহানা মত করো। যানা হ্যাঁয় তো ইসকি অন্দরসে যাও। নহী যাওগে তো হট যাও। তুমহারা দর্শন নহী হোগী।
ইচ্ছে হচ্ছে, শ্রীহনুমানের ঢঙে 'নিল ডাউন' হয়ে হাত জোড় করে মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠি - তোমার কণা সীমাহীন হে শান্তির প্রহরী।
অর্ধেন্দু অসহায় স্বরে জিজ্ঞেস করে - কি করবেন?
- কি আর করব! যেতে যখন হবে, তখন ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় কি?
- কিন্তু ...
- কোনো কিন্তু নয় চলো রামনাম জপ করতে করতে গেট পার হওয়া যাক। তারপরে যা হবার হবে।
আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে পুলিশ অফিসার মুচকি হাসেন। তাঁর ভাবখানা - কেমন জব্দ! ভেবেছিলে বাহানা করে পার পেয়ে যাবে।

রামনাম জপে বৈতরণি পার হওয়া যায়, আর এই ছোট দরজাটি পার হওয়া যাবে না? আমি ত্রস্ত পদক্ষেপে দরজাটি প ার হয়ে আসি।

অর্ধেন্দু পেছন পেছন এসে আমার কাঁধে একখানি হাত রেখে জিজ্ঞেস করে - কোনো কষ্টবোধ করছেন না তো, একটা সর্বিট্রেট ট্যাবলেট জিভের তলায় দিয়ে একটু জিরিয়ে নেবেন কি?

একটুকাল চুপ করে থাকি। কয়েকটি নিশ্বাস নিই। তারপরে বলি - রামনাম করে হনুমান সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। আর অ ামি এই একচিলতে দরজাটুকু পার হতে পারব না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, আমি ভালো আছি।

- কিন্তু এই লোকগুলোর কথা ভাবুন তো? সুরক্ষার নামে কি জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে যে আপনি বলতে হয়, তা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

- কি করবে? পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতা যে শোষণকে এদেশে শতরূপে কায়েম করেছে।

আমরা এগিয়ে চলি। না, কোনো বাঁধানো রাজপথে নয়, লোহার খাঁচার ভেতর দিয়ে।

বাসস্ট্যান্ডে যেমন লাইন দেবার জন্য পাইপের বেড়া থাকে, সেইরকম স বেড়ার ভেতর দিয়ে। তবে এখানকার বেড়া মাথ ার ওপরে এবং দু-পাশে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। দেশে ও বিদেশে বহু মন্দির, মসজিদ, গুদ্বারা, গুমপা, গির্জা, প্যাগোড া, প্রভৃতি দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কি ন্তু এমন খাঁচার ভিতর দিয়ে কোথাও যেতে হয়নি। কি করব, ভারত যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছে। একে স পথ, তার ওপরে ভক্তের সারি। অথচ আজ কোনো বিশেষ তিথি কিম্বা ছুটির দিন নয়, তার ওপরে জ্যৈষ্ঠ মাসের অযোধ্যা। অর্থাৎ বছরের ৩৬৫ দিনই এখানে এমনি ভিড় হয়, উৎসবের কথা বাদই দিলাম। তাহলে আর কি কোনো যুক্তির প্রয়োজন আছে? প্রতিদিন এই অগনিত যাত্রী সমাগম কি এখ ানে একটি মন্দির নির্মাণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করছে না? এবং এখানে পাশাপাশি দুটি মন্দির ও মসজিদ নির্মিত হলে রিয় াধের মতো খেটে খাওয়া অযোধ্যাবাসীরা উপকৃত হবেন।

জায়গাটা মোটেই সমতল নয়। সুতরাং যাত্রীর সারি কখনও ওপরে উঠছে, কখনও নিচে নামছে। আমরা সেই সারির সঙ্গে চলেছি। কিন্তু চলেছি তো চলেছিই। বেশ দীর্ঘ পথ। এবং এই দৈর্ঘ্যের কারণ লোহার খাঁচা। আর খাঁচার কারণ যাত্রী সমাগম।

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কেন এই কঠোর নিরাপত্তা? পেন ও নস্যির কৌটো নিয়ে আমাকে ঢুকতে দিল না কেন? অর্ন্তঘ াত? আতঙ্কবাদী? কিন্তু তারা এখানে কি ধবংস করবে? এখানে তো মন্দির - মসজিদ কিছুই নেই। তাহলে এই নিছিদ্র নির াপত্তা কেন? যাত্রীদের জন্য? কিন্তু যাত্রীদের মারতে তারা এই পুলিশবেষ্টিত স্থানে আসবে কেন? রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, সরযূর ঘাট - যে কোন জায়গাতেই তো অনেক সহজে হামলা করতে পারে। আর তা করলে আমাদের কোতোয়াল স াহেব যে কিছুই করতে পারবেন না, তারও প্রমাণ পেয়েছি গতকাল। অতএব এই নিরাপত্তা অর্থহীন প্রশাসনিক অপব্যয়। আর এই ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে দরিদ্র দেশের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মপ্রাণ মানুষদের।

অবশেষে অকুস্থলে উপস্থিত হওয়া গেল। শেষ দিকটায় আমাদের খানিকটা চড়াই ভাঙতে হয়েছে। আমরা একটা ভ গ্নস্তুপের গায়ে উঠে এসেছি। এখানে অনেকখানি জায়গা সমতল করা হয়েছে।লোহার খাঁচাও খানিকটা চওড়া এবং দু-ভ াগে বিভক্ত। বাঁদিকের অংশ জুড়ে বন্দুক হাতে একসারি পুলিশ। তাঁরা আমাদের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

ডানদিকে খানিকটা জায়গায় জাল নেই। ওপাশে ধবংসস্তূপের বাকি অংশ। ওখানেও জায়গা সমতল করে ত্রিপলের ছ াউনি তৈরী করা হয়েছে। তার তিনদিকে ঘেরা, কেবল এদিকটা ফাঁকা।

লোহার জালের ওপাশে ছাউনি আর এই খাঁচার মাঝখানে একজন পূজারী বসে আছেন। তিনি ছাউনির দিকে ইসারা করে বলেন - রামজন্মভূমি দর্শন কন। ঐ দেখুন, জন্মভূমিতে সিংহাসনে বসে আছেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র, একক বালমূর্তি। অ ার তার পায়ের কাছে বসে আছেন তিনভাই, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। ডানদিকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা দশরথ। তাঁর পাশে লাল পাথরের হনুমানজি।

আমরা দর্শন করি, প্রার্থনা করি- হে মানুষের ভগবান, তুমি আমাদের অমানুষদের হাত থেকে রক্ষা করো।

তোমার নামে এই ধর্মান্ধতা বন্ধ হোক। তোমার এই ভারতভূমিতে পুনরায় সত্য, ন্যায় ও ত্যাগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক।

পূজারীর সামনে প্রণামীর থালা আর প্রসাদের ধামা। প্রসাদের প্যাকেট দুটি তাঁর হাতে দিই। তিনি একটি প্যাকেট ফিরিয়ে দেন। সেই সঙ্গে কয়েকটি এলাচদানা।
প্রণামীর থালায় পাঁচটি টাকা দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে আরেকবার প্রণাম করতে চাই, পারি না। পাশ থেকে একজন পুলিশ আমার পিঠে তাঁর ব্যাটনের খোঁচা দিয়ে বলে ওঠেন - চলিয়ে, পিছেওয়ালাকো দর্শন করনে দিজিয়ে।
মনে মনে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলি। আর ভাবি, জগতে কোথাও ভক্তদের এমন বন্দীদশায় ভগবানকে দর্শন করতে হয় বলে জানা নেই আমার।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com